মুখবন্ধ:

আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। একদিন নৃতাত্ত্বিক সাউটুউলা পৃথিবীবাসীকে একথা জানিয়েছিলেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটা ছিল মহত্তম আবিষ্কার। আজ থেকে প্রায় ৪০,০০০ হাজার বছর আগে আদিম মানুষ গুহার দেওয়ালে প্রথম ছবি আঁকে। তাদের ছবির বিষয় ছিল শিকারের ছবি, হরিণের ছবি। ইতিহাস পূর্ব এই সময়ে জীবন সংগ্রাম, প্রয়োজন এবং উপযোগ প্রধান ছিল। শিল্পের উৎপত্তি সূত্রের নির্যাস এখান থেকেই। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা শিল্পের হাত ধরেই শুরু হয়েছে। আদিম মানুষের গুহাচিত্র প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্যমূর্তিতে রূপ লাভ করেছে। আদিম মানুষের শিল্পবোধ সময়ের সাথে সাথে প্রাণবন্ত হয়ে এগিয়েছে।

লোকশিল্প প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত মানুষের শিল্প। এই শিল্পে থাকে জীবনের অঙ্গীকার। লোকশিল্পে জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের প্রতিফলন থাকে। লোকশিল্পে ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার প্রধান বিষয়। লোকশিল্পের স্রষ্টা, বাহক, রক্ষক এবং সঞ্চালক হল নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ। গ্রামজীবন, লোকায়ত ভূগোল এবং কৃষি নির্ভরতা লোকশিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলার লোকশিল্পে অনেক জায়গা জুড়ে আছে ধর্মীয় অনুশাসন। লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশে রয়েছে নারীর ভূমিকা। লোকশিল্প গড়ে উঠেছে মাটি, কাঠ, পাথর, লতা, পাতা, পশুপাখির দেহাবশেষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানে। গ্রাম্য মানুষ যেমন সরল, অনাড়ম্বর, সাধাসিধে, লোকশিল্পও তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। লোকশিল্প প্রয়োজন নির্ভর, ইহকেন্দ্রিক। এভাবেই লোকায়ত মানুষের হাতে তৈরি প্রতিটি দ্রব্য কমবেশি হলেও শিল্পকর্ম। একথা সত্য, সময়ের সাথে সাথে অনেক লোকশিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে, অনেক লুপ্তপ্রায়।

অজস্র বৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলার লোকশিল্প। ঢেঁকি, চাটাই, পালকি, শিকে, প্রদীপ, চামর, পটচিত্র, আলপনা, শীতলপাটি, বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাদামাটির শিল্প, নকসী কাঁথা প্রভৃতি হল লোকশিল্প। অনেক শিল্প বেঁচে নেই অথবা অনেক ক্ষয়িষ্ণু। মধ্যযুগের বাংলা লোকশিল্পের সুবর্ণ সময়। গ্রামকেন্দ্রিক সুসংহত সমাজ এই পর্বেই গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক বাংলায় বাঙালির এই একান্ত নিজস্ব

লোকায়ত শিল্পের উপর বণিকের লোভী নখর ধরা পড়ল। ঔপনিবেশিক শাসন, শিল্প বিপ্লব এবং অধুনা বিশ্বায়নের ফলে অনেক লোকশিল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে গেল। লোকশিল্পের বর্তমান অবস্থা সঙ্কটের মুখে। ভবিষ্যতে যে লোকশিল্প বেঁচে থাকবে তা হয়তো বিশুদ্ধ লোকশিল্প নয়। সেই লোকশিল্প হবে পরিবর্তিত চলমান লোকায়ত মানুষের অন্যতর বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ শিল্পরূপ।

পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য বেদে যেমন লোকশিল্পের উল্লেখ আছে তেমনি সংস্কৃত রামায়ণ এবং সংস্কৃত মহাভারতেও অজস্র লোকশিল্পের উল্লেখ রয়েছে। বেদের যুগে মানুষ কৃষি কাজ করেছে, ধাতুর ব্যবহার শিখেছে এবং গ্রাম গড়ে তুলেছে। মানুষ পূজা করেছে, আরাধনা করেছে। হাতির দাঁতের কাজ, ধাতব পাত্র, বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, ধনু, রথ প্রভৃতি শিল্প গড়ে তুলেছে। শিল্প মুখরতার মহতী উত্তরণ বেদের যুগেই ঘটেছিল। প্রাচীন বাংলায় মাটির খেলনা, ঘট, জলচৌকি, নৌযান, অশ্বযান, পালকি, তালপাতার দুল, ঘুঙুর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। চর্যাপদে বীণাযন্ত্র, মাদল, করতাল, কুঁড়েঘর প্রভৃতি লোকশিল্পের ব্যবহার মেলে।

বাংলার লোকসাহিত্যে লোকশিল্পের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটেছে। লোকসাহিত্য যদি লোকশিল্পের অঙ্গনকে স্পর্শ না করতো, তবে অনেক লোকশিল্প কালের গভীরে, বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরকালের মতো হারিয়ে যেত। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, রূপকথায় উল্লেখ আছে হারিয়ে যাওয়া অথবা ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পের। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কিভাবে পুরাতন লোকশিল্পের উল্লেখ রয়েছে সেই অনালোচিত এবং অনাবিষ্কৃত অধ্যায় অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সেই অনার্য সাঁওতাল ব্যাধ যুবকদ্বয় – তাদের সাতফলা, নল, তীর-ধনুক-বাটুল দিয়ে শিকার- এসব আমি দেখেছি, দেখেছি লাঙল-জোয়াল-মই আর হালের বলদ নিয়ে রোদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অনেক 'বুলান মণ্ডল'কে মাঠে চাষ করতে। দেখেছি, শিল্পী শ্রীপতি দাস-কে চাটাই তালাই বুনতে। আর সেই নারাণ কাকা – সরস্বতী পুজোর রাতে রঙ কাগজ কেটে নানা নকসা, টিয়া পাখি – নৌকো তৈরি করতে। আর সেই মদন ঢাকি, যিনি বাজাতেন ঢাক। মনে পড়ে সেই ফাল্গুনি রাতে জ্যোৎস্নায় বিধানবাবুর বাঁশের

বাঁশীর মন কেমন করা সুর, এসব আমি শুনেছি। আর সেই শিল্পী ধীরেন বাবু, লোকসমাজে উপেক্ষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। জুতো এবং ঢাক ঢোল তৈরি করতেন। এই তুচ্ছ-ব্রাত্য, অপাংক্তেয় পল্লী শিল্পীগণ আমার গবেষণার উৎসমুখকে খুলে দিয়েছিল। এদের অনেকেই আজ নেই। এরা তো শিল্পী? এদের নিয়ে কাজ করলে হয় না? মনে হতো, বিস্মৃত উপকথার মত এরা হয়তো একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। অভিজ্ঞতা মানুষকে কত কি দেয়! আধুনিক কবিতার ছাত্র আমি। কবিতা লেখার অভ্যেস অনেকদিনের, গল্প-উপন্যাসও আছে। পত্রিকার সম্পাদনাও করেছি। তাই গবেষণার গভীরে চট করে ডুব দিতে চাইতুম না। কিন্তু কেমন একটা টান অনুভব করতাম চারপাশের দারিদ্র্য জর্জর পল্লী শিল্পীদের জন্য। যথার্থই এরা আমার অন্তরের একটা বড় অংশ অধিকার করে নিয়েছে। তাই কখনো কখনো এই ব্রাত্য জীবনের পদধ্বনি অনুসরণ করতে করতে চলে গেছি অনেক দূর পর্যন্ত। এমন কি কবিতা-উপন্যাস লেখাও ভুলে গেছি। সুদীর্ঘ সময় পায়ে পায়ে অভিজ্ঞতা আহরণ, গভীর পড়াশুনায় দিন রাত ভুলে যেতুম। লোকশিল্প নিয়ে গবেষণা যত এগিয়েছে, ততই লাভ করেছি অমৃতের স্পর্শ। এক বিস্ময়! সমুদ্রের অতল গভীরে মুক্তোর রাশি! এখনও যে কত পথ হাঁটতে হবে জানি না। আমার গবেষণার শিরোনাম- "কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরাতন লোকশিল্প : সমাজচিত্রের পর্যালোচনা"-জ্ঞানের বিন্দুবৎ প্রবাহে সামান্য আলোকচ্ছটা মাত্র। সিন্ধুতে বিন্দুর মত। অশান্ত অনন্ত সমুদ্রের গভীরে থাকা অগণিত ঝিনুকের মধ্যে হয়তো একটি।

এই গবেষণা কর্মের জন্য আমার ঋণ অনেক। আমার পিতৃদেব ৺সাধনচন্দ্র দাস এই নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার জন্য আমার প্রথম প্রেরণা। বাবা ছিলেন শিল্পী। আর আমার জ্যাঠামশাই ৺শক্তিপ্রসাদ দাস এবং কাকাবাবু সুদর্শনচন্দ্র দাস এরাই আমার কাজের অন্তরের প্রেরণাশক্তি। অনেক ইচ্ছে ছিল, ওদের জীবিত অবস্থায় আমার গবেষণাকর্ম আলোর মুখ দেখবে। কিন্তু হঠাৎই বাবা এবং জ্যাঠামশাই চলে গেলেন। হয়তো দূরলোক থেকে ওনারা আমার কাজের ধারা প্রত্যক্ষ করছেন। আর দূর দ্বীপবাসিনী সাগরের অধিবাসী আমার বড় পিসিমা, আমার মা, আমার পিসতুতো শান্তদাদা যাদের হাত ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রান্তরে প্রান্তরে লোকজীবন ও

লোকশিল্প সম্পর্কে আমার ব্যাপৃত অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে। আর সেই আমার সুনীল জানা- বাবু এই শিক্ষক-ঔপন্যাসিক, পত্রিকা সম্পাদক মানুষটি যিনি আমাকে সাবালক লেখক হয়ে উঠতে প্রেরণা দিয়েছেন, সেই তিনি, গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন, লিখিয়ে নিয়েছেন, সারা রাজ্যে নিরন্তর ছুটিয়েছেন, পরিণামে আমার লেখক সত্তা। উনিই আমাকে 'দ্যোতনা' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদকরূপে সম্মানিত করেছিলেন। এ কাজ যখন শুরু হয়েছিল তখন আমি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভট্টর কলেজ', দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুরের অধ্যাপক। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়তই সুবর্ণরেখার নদীতীরে বসতাম। ক্ষেত্রীয়-সমীক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে দূর দূরান্তে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছি। মত বিনিময় করেছি। ছেলেমেয়েরা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষত আমার পূর্বতন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় রামেন্দ্রনাথ ভূঞ্যা মহাশয়ের উৎসাহ সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী তপশিলী নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য মানুষের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিল। দাঁতনের সাধারণ মানুষের সরল আন্তরিকতা আমি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো। দীর্ঘদিন গবেষণার সুবাদে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারে। ওনার সুপরামর্শ আমার মনে থাকবে। আর ড. শিবানী ঘোষ – আমাকে সব রকম সাহায্য করেছিলেন। ওনারা ভাল থাকুন। আর মহিষাদলের প্রখ্যাত লোকশিল্প সংগ্রাহক শ্রী অশোককুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর সুবিশাল সংগৃহীত লোকশিল্পের সম্ভার ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার শিক্ষক প্রফেসর লায়েক আলি খান (পি এইচ.ডি., ডি.লিট) মহাশয়। স্যারের কাছে আমার ঋণ অশেষ। আমার বর্তমান গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সুজিতকুমার পাল মহাশয় আমাকে কাজ শেষ করার জন্য নিরন্তর তাড়া দিয়েছেন। ওনার তৎপরতার জন্যই মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে এই গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করা গেছে। কেননা ইতিপূর্বে আমার গবেষণার কাজ ছিল সমগ্র মধ্যযুগ। সেই সুবিশাল গবেষণাকর্ম আমি সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলাম। তার পরে আমার বিষয় শিরোনাম পরিবর্তিত হয়। ব্রাত্য শিল্পীদের ভালোবেসেই এই পথ বদল। তবুও ভুলি নি

কবিতাকে, ভুলি নি জীবনকে, যার ফসল নিশ্চয়ই আমার কবিতার বই ও আমার লেখা গল্প উপন্যাস-প্রবন্ধ সমূহ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রতিনিয়ত কাজ জমা দেওয়ার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী প্রফেসর ড. বাণীরঞ্জন দে বন্ধুত্বের অনুরোধে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। আর আমার রিফ্রেসার কোর্সের বন্ধু সহযোগী প্রফেসর ড. সরোজকুমার পান মহাশয় তো আছেনই। আর আছেন মাননীয়া প্রফেসর ড. ছন্দা ঘোষাল মহাশয়া, যিনি খবর নিয়েছেন আমার গবেষণা কর্মের, লেখার উৎসাহ দিয়েছেন। আর নবাগত অধ্যাপক ড. মহর্ষিবাবু কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েট পঠন-পাঠনের বিষয়ে নানাভাবে মত বিনিময় হয়েছে ওনার সঙ্গে। আর সেই ধূপগুঁড়ি কলেজের বাংলার অধ্যাপক বন্ধু নারায়ণদা (নারায়ণচন্দ্র জানা) প্রতিনিয়ত আমার চিন্তা চেতনায় মিশে থেকে নিরন্তর উৎসাহিত করে গেছেন। আর 'বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়'- এর – আমার প্রাক্তন সহকর্মী ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা ড. মধুমিতা রায় যিনি বর্তমানে শিবপুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপিকা রূপে কাজ করছেন, তিনি আমাকে নিরন্তর গবেষণাকর্মে সমানভাবে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন।

এবার আসবো আমার দাদা, সহকর্মী আমার ভাবনাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখা মানুষটি, তিনি হলেন রহিমদা। ড. আবদুর রহিম, ভট্টর কলেজের সহকর্মী, অর্থনীতির অধ্যাপক, মহিষাদল রাজ কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.জি. কাউন্সিলের প্রাক্তন সেক্রেটারী। এই সহৃদয় মানুষটির সস্নেহ প্রশ্রয়, ঔদার্য, উৎসাহ, সহানুভূতি না থাকলে আমার পি এইচ.ডি. উপাধি অধরাই থেকে যেতো। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের প্রয়োজন হয়েছে, তখন এই দাদাই নিজের লাইব্রেরী কার্ড থেকে বই তুলে দিয়েছেন। বউদির হাতের রান্না খেয়ে পড়াশুনার কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি। আর আমার বিশেষ বন্ধু মহিষাদল রাজ কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মানস কুমার মাইতি মহাশয় আমার গবেষণার জন্য কলেজ লাইব্রেরী থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বই সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া হলদিয়া গর্ভমেণ্ট কলেজের ভূগোল বিভাগের বন্ধু অধ্যাপক ড. পীযুষকান্তি ত্রিপাঠী মহাশয় এবং হলদিয়া আইকেয়ার প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনারত বাণিজ্য বিভাগের বন্ধু দুর্গাপ্রসাদ বেরা-র সাহচর্য আমার গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

দূরের কলেজের চাকরির অস্থিরতা, ট্রান্সফারের জটিলতা, সর্বোপরি কঠিন অসুখে ভোগা, বিষণ্নতা জীবন হয়ে যাচ্ছিল অসম্পূর্ণ। তবুও কাজটা আমি করেছি। এরজন্য আমার দুই কন্যারত্ন বড় মেয়ে বাবু (অন্বেষা) এখন ইনটার্ণ এম.বি.বি.এস. ডাক্তার এবং ছোট মেয়ে মিঠি (অর্কতৃষা) সদ্য এইচ.এস. পাস করেছে। এরা দিনরাত আমার পাশে পাশে ঘুর ঘুর করে অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টে বইয়ের অর্ডার দিয়ে নানা ইংরেজী বই সংগ্রহ করে দিয়েছে। শুধু বলেছে 'বাপী তুমি কবে ডক্টরেট হবে'? আমার স্ত্রী ইংরেজী বিভাগের শিক্ষিকা (বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা) তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে, এমন কি ঝড় বৃষ্টির দিনেও গাড়িতে করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে বইপত্র সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে। আমি খুশি যে একটা গোটা জীবনের অধ্যবসায় কাজটার পেছনে জুড়ে আছে। এই কাজের জন্য আমি মূলতঃ কলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় – সাহিত্য পরিষৎ, আশুতোষ মিউজিয়াম (কলকাতা), দাঁতন 'ভট্টর কলেজ'-এর গ্রন্থাগার, মহিষাদল প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিভবনের গ্রন্থাগার, মহিষাদল রবীন্দ্র পাঠাগার, চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার, আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র 'বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়'-এর (চৈতন্যপুর) গ্রন্থাগার এবং আমার ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ ব্যবহার করে এই গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করেছি। আর ছোট ভাই দেবাঞ্জন চক্রবর্তী সমস্ত টাইপ করে দিয়েছে। মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ.ডি সেলের সুশান্ত বাবু এবং রাজেশবাবু লালফিতের জটিল ফাঁসের মধ্যে থেকেও কেবলই আমাকে উৎসাহিত করে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আমি আবদ্ধ। আমার দাদু-ঠাম্মা, মা এবং অপাংক্তেয় মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে আমার মাথার উপর। জীবন থেমে থাকে না। আমার অজস্র অছাপা লেখালেখির পাণ্ডুলিপির সম্ভার মুখ চেয়ে আছে আমার দিকে,

প্রকাশের অপেক্ষায়। আমার গবেষণার উপাধিবৃত্ত সম্পূর্ণ হলে ভবিষ্যৎ অ্যাকাডেমিক পরিকল্পনার নব সম্ভাবনার উৎসমুখ নতুনভাবে উন্মোচিত হবে।

বিনীত